বারো ইমামের অনুসারী শিয়াদের দৃষ্টিতে চার ইমাম (আবু হানিফা, মালেক, শাফে‘ঈ ও আহমাদ)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ আরেকটি অপবাদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

তাদের আরেকটি অপবাদ হলো, শাসকগোষ্ঠীর কুপ্রবৃত্তি অনুযায়ী চার মাযহাব তার গতি পরিবর্তন করে

যে ইমামিয়ারা এই অপবাদটি আরোপ করে তাদের একজন হল হাশেম মারুফ আল-হুসাইনী।[1] তিনি বলেন, “চার মাযহাবের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এই আলোচনার প্রেক্ষিতে এটাই ফুটে উঠে যে, যেসব কারণে এ মাযহাবগুলো বিস্তার লাভ করেছে এবং স্থায়িত্ব পেয়েছে তার মধ্যে প্রধান কারণ হল - এই মাযহাবগুলো জন্ম লাভ করার পর হতে নিকট অতীত পর্যন্ত সময় অবধি সবসময় শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল।”[2]

বার-ইমামী অনুসারী আরেক শিয়া মুরতাজা আল-আসকারী[3] বলেন, “অতঃপর শাসকরা যে মাযহাবকে সমর্থন দিয়ে আইন হিসেবে গ্রহণ করত সে অনুযায়ী আমল চলত এবং সেটাই আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামের মর্যাদা পেত। আর ভিন্নমত পোষনকারী ও তার মতকে ছুড়ে ফেলা হত...এমনকি শেষ পর্যন্ত শাসকগোষ্ঠী ফিকহের চার মাযহাবের মধ্য থেকে কোনো একটি মাযহাবকে জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে অট্টহাসি হাসত।...স্বভাবতঃ জনগণ শাসকদের ধর্মের অনুগত হয়ে থাকে। এ কারণে সাধারণ মানুষ তাদের শাসকের মাধ্যমে বাস্তবে যেটাকে ইসলাম হিসাবে দেখল সেটাকে গ্রহণ করল এবং শাসকরা যেসব হুকুম-আহকাম, আকীদা-বিশ্বাস ও হাদীসকে সমর্থন দিল সেগুলোকেই মেনে নিল। এভাবে শাসকদের অনুসারীরা আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহ্ খেতাব পেল।”[4]

মোটকথা: গোঁড়াপন্থী এই দুই শিয়া যা বলল কোনো শিয়ার মুখে এ ধরনের কথা বেমানান নয়। কারণ তারা তাদের ইমামদেরকে বিদ্রোহী নেতা মনে করে এবং তাদের ধর্মকে বিদ্রোহী ধর্ম মনে করে। তারা মনে করে, স্থান-কালের ভেদাভেদ ছাড়া কেবল শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার মাধ্যমেই তাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে।[5]

হুসাইন আলে উসফুর বলেন, “যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমীরুল মুমেনীন ‘আলাইহিস সালাম এর কাছে ক্ষমতা আসল তখন তিনি তাদের প্রণীত অনেকগুলো বিদ‘আতী নীতিমালাকে পরিবর্তন করে দিলেন। কিন্তু তারপরও অনেকগুলো থেকে গেছে। সেগুলোকে তিনি পরিবর্তন করতে পারেন নি। কারণ সেসময় বিরোধীর সংখ্যা ছিল বেশী। এরপর যখন উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল তখন তারা জঘন্য বিদআতের আগুন জ্বালাল। বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করে ন্যাক্কারজনক পরিস্থিতি তৈরী করল। তারা ঐসব নীতিমালার মধ্যে নতুন নতুন সংযোজন করতে থাকল এবং পূর্ববর্তীরা যে পথ রচনা করে গিয়েছিল তারাও সে পথে অগ্রসর হল। এভাবে তারা গোলক ধাঁধাঁর সৃষ্টি করল। ফলে মানুষ আর সঠিক পথ খুঁজে পেল না। এভাবেই চলতে থাকল। এক পর্যায়ে ক্ষমতার চাবিকাঠি বনী আব্বাসের হাতে হস্তান্তরিত হয়। যারা ছিল বাঁদী-দাসী, গান-বাজনা ও শরাবপ্রেমী।

তাদের শাসনামলে সাধারণ মানুষের চেয়ে ফিকহবিদদের সংখ্যা বেড়ে যায়। তারা ফিকহবিদদের অতি কদর করা শুরু করে এবং মানুষকে নির্দেশ দেয় যে, তাদের কাছ থেকে ফতোয়া গ্রহণ করতে। তাদের কাছে বেশী মূল্যায়ন পেত সেসব ফকীহরা, যারা রাসূলের বংশধরদের প্রতি বেশী বিদ্বেষ পোষণ করত এবং আকীদা-বিশ্বাস ও মাসয়ালা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে আহলে বাইতের সাথে বেশী খেলাফ করত। সে যুগে অনেক বড় বড় ফকীহ ছিল।

তদুপরি আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ ইবন হাম্বল এবং তাদের মাযহাবের অনুসারীরা তাদের কাছে বেশী কদর পেত। যেহেতু তারা ছিল আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষপোষণ ও জুলুম করার জন্য প্রসিদ্ধ। এছাড়া যেহেতু ইবলিসের প্ররোচনায় তারা মানুষকে প্রতারিত করার পথ বেছে নিয়েছিল। বাহ্যতঃ তারা মানুষকে দেখাত যে, তারা দুনিয়াবিরাগী, শাসকদের থেকে দূরে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা দুনিয়া পাওয়ার জন্য এবং তাদের আদর্শের প্রতি মানুষকে ঝুঁকানোর জন্য এসব করত। যেহেতু বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার প্রতি অনীহা না দেখালে আসলে দুনিয়া পাওয়া যায় না। এভাবে তারা সেসব মানুষের মন ও মগজ আকর্ষণ করতে সক্ষম হল যারা ছিল আসলে পশুর তুল্য, বিবেকহীন। একদল মানুষ তাদের পণ্যকে বাজারজাত করল এবং তারা দ্বীনের মধ্যে যেসব নতুন বিষয়ের উদ্ভব করেছিল নানা ব্যাখ্যা ও সংস্কারের কথা বলে তারা সেগুলোকে ধামাচাপা দিয়ে রাখল।”[6]

তাদের আরেক আলেম মুহাম্মদ আত-তিজানী তার ‘ছুম্মাহতাদাইতু’ কিতাবে বলেন, “চার মাযহাবের মধ্যে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং এই মাযহাবগুলো আল্লাহ্ ও তার রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পক্ষ থেকে নয়।”[7] তার অন্য একটি কিতাব ‘আশ শিয়া হুম আহলুস সুন্নাহ’ তে বলেন, “এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি শাসকগোষ্ঠী যে মাযহাবগুলোর উদ্ভাবন করেছে এবং সেগুলোর নাম দিয়েছে ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ্’, সে মাযহাবগুলো কিভাবে প্রসার লাভ করেছে... এরপরে আরেকস্থানে গিয়ে বলেন, এই গবেষণাতে আমাদের উদ্দেশ্য হল দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে একথা সাব্যস্ত করা যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মাযহাবগুলো রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট।”[8]

ফুটনোট

[1] বার-ইমামের মতাবলম্বী সমকালীন শিয়া লেখক। তার লিখিত গ্রন্থের নাম হচ্ছে- ‘আল মাবাদিউল আ-ম্মাহ্ ফিল ফিকহিল জা’ফারী’।

[2] ‘আল মাবাদিউল আ-ম্মাহ্ ফিল ফিকহিল জা’ফারী’ লেখক: হাশেম আলহুসাইনী, (পৃঃ ৩৮৫)।

[3] সমকালীন ইমামিয়া শিয়াদের একজন। ১৩৯১ হিঃ সালেও তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি ‘খামসুনা ওয়া মিআতু সাহাবী মুখতালাক’ নামক গ্রন্থের লেখক এবং বাগদাদের ‘কুল্লিয়াতু উসুলুদ দ্বীন (আল ইমামিয়া) এর প্রতিষ্ঠাতা। দেখুন: তার কিতাবের ভূমিকা ‘‘খামসুনা ওয়া মিআতু সাহাবী মুখতালাক’ (পৃঃ ১৯)এবং ‘আসলুশ শিয়া ওয়া উসুলুহা’ (পৃঃ ৬৩)।

[4] ‘আসলুশ শিয়া ওয়া উসুলুহা’ গ্রন্থের ভূমিকা (পৃঃ ৫৯-৬০)।

[5] পাঠক এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাইলে তাদের নিম্নোক্ত বইগুলো পড়তে পারেন- মুহাম্মদ মাহদী শামসুদ্দীনের ‘ছাওরাতুল হুসাইন’, মুহাম্মদ জাওয়াদ মুগান্নিয়ার ‘আশ শিয়া ওয়াল হাকেমুন’, ড. মুসা আলমুসাবির ‘আছ ছাওরা আল বায়িসা’।

[6] শায়খ হুসাইন আলু উসফুর আদদারাযি আল বাহরাইনীর ‘আলমাহাসিন আননাফসিয়্যাহ্ ফি আজওবিয়াতিল

মাসায়িল আল খুরাসানিয়্যাহ্’। (পৃঃ ১২), জমইয়্যাতু আহলিল বাইত কর্তৃক ‘আল মাশরিক আল আরাবী আলকাবীর’ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৩৯৯ হিঃ।

[7] ছুম্মাহতাদাইতু, লেখক: ড. মুহাম্মদ আততিজানী (পৃঃ ১২৭)।

[৪] ‘আশ শিয়া হুম আহলুস সুন্নাহ্’ লেখক: ড. তিজানী (পৃঃ ১০৪-১০৯)।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9873

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন